SARANIK

College Magazine

2019-2021

KISHORE BHARATI BHAGINI
NIVEDITA COLLEGE (CO-ED)

সারণিক

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা কলেজ (কো-এড)

বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা

২০১৯- ২০২১

শিক্ষক সম্পাদক মণ্ডলী
সুদক্ষিণা ঘোষ
রঞ্জিনী বসু
শিপ্রা ঘোষ (আহ্বায়ক)

From The Principal's Desk

We are going through difficult times amidst the global pandemic. The education system has changed from chalk and talk to e-learning mode. I am thankful to my students, teachers and non-teaching staff for their constant effort to maintain the norms and values of the institution. Under these stressful circumstances, it gives me immense pleasure to present before you the creative expressions of students and staff who have contributed to the magazine. This magazine gives each individual the opportunity to express their artistic and literary talent so that their varied interests find sustenance in the outer world. The college works collectively to serve the cause of education so that the students today can live in a freer world. I extend my heartfelt congratulations to the editorial team of “SARANIK”, and all the stakeholders for their perennial efforts in bringing the magazine to its present stature. I sincerely hope that this creative endeavour brings positive vibes to the readers.

পরিচালন সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা (কো- এডুকেশন) কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে কলেজের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা সারণিক-এর প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। দুঃসহ মহামারী কালের বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে কলেজ খুলেছে, কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ হচ্ছে , এটা অত্যন্ত আনন্দ ও খুশির কথা।

পত্রিকাটি যাতে আগামীদিনে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশের একটি যথাযোগ্য আধার হয়ে ওঠে , সেটা যেমন সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব, তেমনি সমাজ-ভাবনামূলক গদ্যচর্চাকে উৎসাহিত করা পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব।

পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

১৬ জুন, ২০২১ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

বিলম্বিত প্রকাশ নিশ্চয়ই । সময়ের বিপুল বাধা ঠেলে প্রকাশিত হচ্ছে কলেজের বার্ষিক পত্রিকা সারণিক। গত দু'বছরের করোনাকালে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে ঝাঁকুনি লেগে পালাবদল হচ্ছে ক্রমাগত । লকডাউন থেকে আনলক হয়ে ফের সেমি লকডাউন, বারবার যেন এইভাবে রিসেট মোডে নিয়ে যেতে হয়েছে জীবনটাকে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন আর সেই সঙ্গেই আমাদের সমাজ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ আলোড়িত । আগাপাশতলা খোল নলচে সব বদল করে নিতে হচ্ছে এখন। পরমাণু বোমা বা বুলেট ফায়ার নয়, ফাইটার জেট বা মিসাইল হানা নয় , মানুষ মানুষের জন্য গত একশ বছরের সন্ত্রাসের যা কিছু পথ আবিষ্কার করেছে, তার কোনটির কারণে নয় ', শুধু একটা ভাইরাসের বাড়বাড়ন্তে পঙ্গু হয়ে রয়েছি আমরা সবাই। বন্দীদশা থেকে নিউ-নরমাল কাটিয়ে যতবারই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েছে সবাই', মাস্ক স্যানিটাইজার আর দূরত্ব বিধিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে ক্লান্তির ছাইয়ে বাতাস দিয়ে ভেতর থেকে জীবনের তাপ উসকে দিতে চেয়েছে, ততবারই এখনো চোখের সামনে 'নীলমৃত্যু উজাগর'। ডেল্টাকে বামন বানিয়ে তার পিছন থেকে দৈত্যের মতো বপু নিয়ে ছুটে এসেছে ওমিক্রন আতঙ্ক। এরইমধ্যে অসহিষ্ণু আমরা সবাই অনেক সময় ভুলে গেছি মাত্র কয়েক মাস আগে ফেলে আসা সেই দুঃসময়ের কথা, যখন বন্ধুর হাত ছুঁয়ে ফেলে সংক্রমণ শঙ্কায় বুক কেঁপেছে আমাদের। পিতার শব সন্তান স্পর্শ করতে পারেনি, নিকটতম স্বজনকে সারা জীবনের মতো বিদায় জানাতে গিয়ে তার কপালে একবার কান্নাভেজা ঠোঁট ছুঁইয়ে আসতে পারেনি কেউ। দূরান্তরে থাকা শ্রমিকের ছিন্ন শরীর আর ছড়িয়ে পড়া রুটি- গুলি দীর্ঘশ্বাস রেখে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। অসহায়তা বিমূঢ়তা অবিমৃষ্যকারিতার নানা রাষ্ট্রীয় প্রদর্শন সম্ভারের মধ্যেই আমাদের শৈশব কৈশোর তারুণ্য ঘরবন্দী দশায় ইট চাপা ঘাসের মতো ফিকে হয়ে যেতে বসেছে। দুরন্তপনার অবাধ উৎসবকেই যেন অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে তারা। সময়ের এই শাসানি আর বিশ্ব ও রাষ্ট্রের নানা বিমূঢ়তায় সংগতি হারানো একটা সময় যেন ছিটকে উঠছে আমাদের সামনে।

তবু প্রাণের জয় অবশ্যম্ভাবী। আর প্রাণের দূত তো তরুণ প্রজন্মই! আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাই। এরাই বারবার মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জীবনকে চিরজয়ী করে। গত দু'বছরে এক আশ্চর্য সময়ের ইতিহাস রচনা হতে দেখল তারাও। অতএব এবার ছাত্র থেকে শিক্ষক সকলেই নিজের নিজের মতো করে করোনাকালের নানা সংকটের কথা প্রকাশ করেছেন এই পত্রিকায়,তাদের নিজের লেখাগুলিতে। আমাদের এই সংখ্যাটি তাই করোনা মহামারী কালপর্বের একটি বিশেষ সংখ্যা।

কলেজের অধ্যক্ষ ড.শিবশংকর সানা এবং কলেজের সদ্য প্রাক্তন আইকিউএসি অধ্যাপক রাজেশ দাস পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। প্রথমেই তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক, যাঁরা এই সংখ্যাটিতে তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করলেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কমিটির সমস্ত সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সংখ্যাটি প্রকাশ হতে পারছে ।পত্রিকাটি প্রকাশের কাজে বিশেষ সহায়তা করলেন অধ্যাপক ড.অর্পিতা সেনগুপ্তা সাধু এবং অধ্যাপক অনিন্দিতা মিত্র। সকলকেই ধন্যবাদ।

মহামারীর সমস্ত গ্লানিকে পরাস্ত করে জীবনের স্রোত চিরজীবী হোক।

শিপ্রা ঘোষ ।

কলকাতা, ২০২১।

এই অতিমারী আবহে অনলাইন শিক্ষা

সঞ্চিতা দত্ত
বাংলা তৃতীয় বর্ষ ২০১৯-২০

বিশ্ব জুড়ে এখন বড় আতঙ্কের নাম ' কোভিড 99 ' বা 'কোরোনা ভাইরাস'। দু বছর হয়ে গেল, এই আতঙ্ক থেকে বেরোতে পারিনি কেউ। অন্য সবকিছুর মতোই, এখন বিশেষত স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি।লাখ লাখ শিক্ষার্থীরা ঘরবন্দি হয়ে এক অজানা ভবিষ্যতের দিন গুনছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, সবার আকুতি একটাই- কবে সবকিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে। কবে থেকে আর অফ -লাইন অন-লাইন মিশ্রব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হবে না আমাদের; স্কুল - কলেজ-ইউনিভার্সিটির করিডরে করে থেকে মাস্ক স্যানিটাইজারের শাসানি উঠে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অফুরন্ত কলরবে ভরে উঠবে সব প্রতিষ্ঠানগুলি।

এই মুহূর্তে দেশে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। এর সুবিধা হল একটি স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে যেকোন স্থান থেকেই পড়াশুনো চালানো যায়। এর ফলে একজন শিক্ষার্থী হয়তো কিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, স্বাধীনভাবে নিজের গতিতে শিখতে পারে কিছু। তবে এটি শুধু একটি বিকল্প বা সহযোগী ব্যবস্থাই মাত্র।

নিত্যনতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট গুলি এখন অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি প্রদান করছে। অনলাইনেই বিভিন্ন প্রফেশনাল ট্রেনিং হয়েছে, ওয়েবিনার হয়েছে অসংখ্য।

মাধ্যমিক পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, কলেজে ভর্তি, সবই সময়ের ছকে বাঁধা। কোরানা-য় এসব কার্যক্রমে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে নিশ্চয়ই। সোস্যাল ডিস্ট্যান্স, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন শব্দগুলোর মতোই অনলাইন ক্লাস এখন এক সুপরিচিত শব্দ। যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে অনলাইন ক্লাস, পরিস্থিতি অনুযায়ী একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠেছে।শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সংস্পর্শ থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে দিলে তারা আরও নাজেহাল হয়ে পড়ত। তাই অনলাইন ক্লাস চালিয়ে যেতে হয়েছে সর্বত্র, তাতে কিছুটা হলেও তারা উপকৃত হয়েছে নিশ্চয়ই।

অনলাইন ক্লাসে পড়ানো ছবি, ভিডিও শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে যাচ্ছে,তার ফলে তারা যতবার ইচ্ছে সেগুলি দেখে নিজেদের কৌতূহল মেটাতে পারছে।

অন্যদিকে অনলাইন ক্লাস বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ভরসাস্থল হলেও প্রশ্ন থেকেই যায়, সত্যিই কি এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হয়ে উঠতে পারে?

যতই আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন দেখি না কেন, গ্রাম ভিত্তিক এই ভারতবর্ষে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে মোবাইল থাকাটাই মস্ত ব্যাপার, সেখানে স্মার্ট ফোন যেন একটা স্বপ্ন। এই কারণে অনেক শিক্ষার্থী ঠিক সময়ে ক্লাস করতে পারে না।

বর্তমান শহর ভিত্তিক পরিবেশের কারণে শিশুরা শৈশবের অনেক কিছুই হারিয়েছে। বিকালবেলা মাঠে গিয়ে যে খেলাধুলা করা যায়, তা অনেকেই জানে না, স্কুল তা ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। স্কুলে গিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি তারা বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা গল্পগুজব করতে পারে। এভাবে অনলাইনে পড়াশোনা চলতে থাকায় তারা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঘরে বসে সারাদিন মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকলে তারাও একটা মেশিনে রূপান্তরিত হবে। বহুক্ষেত্রেই এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিষাদ এবং মানসিক বিকার দেখা দিচ্ছে।

স্কুল কক্ষের বিকল্প হিসাবে আমারা কখনোই অনলাইন ক্লাসকে ধরে নিতে পারি না। কারণ শ্রেণিকক্ষে মুখোমুখি বসে পড়লে কোন ছাত্র বা ছাত্রী সেই বিষয়টি বুঝতে পারছে কিনা তা সহজেই বুঝতে পারেন শিক্ষক, অনেক সময়ই তা বোঝা যায় না অনলাইন ক্লাসে। স্কুল-কলেজে উদযাপিত হয়ে আসা অনুষ্ঠানগুলি এখন অনলাইনে পালন হলেও, সকলে একসঙ্গে এগুলি উদযাপন করার আনন্দ আর তার মধ্যে থাকে না।

সামনাসামনি থাকলে মানুষ মানুষকে ছুঁয়ে থাকতে পারে। ছোটরা দৌড়েঝাঁপ করছে এমনকি মারপিট করছে, সেটাও তো একরকম ছুঁয়ে থাকা। সামনে থাকলে অনেক বিবাদ হয়, তবুও মানুষ মানুষের মুখ না দেখে থাকতে পারে না বোধহয়। এই সাহচর্য থেকে ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্ররা শিক্ষকের সাহচর্য পাচ্ছে না দীর্ঘসময় ধরে, আবার শিক্ষকেরাও ছাত্রদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে একটা মেকানিক্যাল ব্যবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছি আমারা। তবে এটাও ঠিক, পরিস্থিতি যখন বাধ্য করে তখন আমরা নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারি না। আশা রাখতে হবে যে, একদিন এই পরিস্থিতি দূর হবে, আর আমরাও আমাদের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে পাব।

LOCKDOWN AND ITS IMPACT ON INDIAN ECONOMY

PRATIK BASU,BA(GEN) 1st YEAR

The Covid-19 Pandemic in India started from March 2020. Government imposed lockdown in India.The Covid-19 in India is very highly infectious and contagious.It spread from people to people.It came from China.In lockdown people stayed at homes and could not move out to the streets.Government made a rule for people to wear masks on their faces when they went out from the homes. Many businesses, factories, shopping malls, stalls, restaurants and shops were closed. This hampered the economy of our country and it was devastated.India's growth in the fiscal year 2020 went down to 3.1% according to the ministry of statistics.The Chief Economic Adviser to the Government of India to the World bank. The rating agencies had India's Economic liberalization in the 1990's. CRISIL state bank of India research estimates a contraction of over 40% in the GDP in Q1 in the Ministry of statistics.

In Nomura Unemployment rose from 6.7% on 15 March to 2.6% on 19 April and then during the lockdown an estimated 140 million people lost employment while salaries were cut for many others.More than 45% of households across the nation have reported an income drop as compared to the previous year. The Indian economy was expected to lose over Rs 32,000 Crore(US$4.2 billion) everyday during the first 21-days to complete lockdown which was declared following the Coronavirus outbreak under complete lockdown less than a quarter of India's $2.8 trillion economic movement was functional up to 53% of businesses in the country were projected to be significantly affected. Supply chains have been put under stress with the lockdown restrictions in place initially there was a lack of clarity in streamlining what an ''essential'' is what is not.Those in the informal sectors and daily wage groups have been at the most risk.A large no. of farmers around the country who grow perishables also faced uncertainty.

Major companies in India such as Larsen and Toubro,Bharat Forge Ultratech Cement Grasim Industries Aditya Birla Group Bhel and Tata motors temporarily suspended or significantly reduced operations. Fast-moving consumer goods companies in the country have significantly reduced operations and are focussing on essentials.

Mostly hard hit were daily wage earners , rickshaw pullers, autodrivers, taxidrivers.They lost their income due to lockdown.Many factories were shut down.Many people lost their jobs. So they could not provide school fees for their children.So their studies were adversely affected.Many migrant labourers went moneyless as there was no work during lockdown.They had no shelter or food and had to walk hundreds of miles on the scorching heat or on cycles and many of them died on the roads.

Therefore the government should take steps so that the economy should not get devastated due to pandemic situations in future.The government should provide financial security to the people of the lower unorganised group so that in the crisis situation they are not left helpless. We should all unite to work for a solution to such a pandemic crisis.

অতিমারী আবহে অনলাইন শিক্ষা

সমীর মণ্ডল ,(ইতিহাস সাম্মানিক)

কোভিড -19 এর জন্য লকডাউন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের অন্যান্য অংশের মতো পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসও বন্ধ করা হয়েছিল । তবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনো যাতে থেমে না যায় সেজন্যই শুরু করা হয়েছিল অনলাইন পঠন-পাঠন।

শহরতলী-অঞ্চলে, গ্রাম এবং ছোট শহরগুলিতে, শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেটের গতি একটি বড় সমস্যা । প্রত্যেকেই সীমাহীন ডাটা প্যাক বা ওয়াইফাই সংযোগের ব্যবস্থা রাখতে পারেন না। বিশেষত লকডাউন এর সময় এগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব ছিল। সব শিক্ষার্থীর কাছে তখন সেই মুহূর্তে ভালো মানের ফোন ছিল না ।ফোন গুলির নেট -কানেকশন 'অন' থাকলে সেগুলি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গরম হয়ে সুইচ অফ হয়ে যায়। বা, চার্জ শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ লকডাউন ঘোষণার ফলে হোস্টেল এবং মেসগুলির আবাসিক ছাত্ররা তাদের প্রতিদিনের পড়াশুনোর অঙ্গ হার্ডকপিগুলিকে রেখে চলে গিয়েছিলেন। ফলে তারা যখন অনলাইন ক্লাসে প্রবেশ করেছে, তখন সেই হার্ডকপিগুলির অভাব স্পষ্ট অনুভব করেছে তারা।

শিক্ষক অধ্যাপকেরা প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী কলেজের ক্লাস নিয়েছেন আমাদের। এর অর্থ হলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় চার ঘন্টা প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়েছে ।এই দীর্ঘক্ষণ প্রতিদিন ডিভাইসের সামনে বসে থাকার জন্য তাদের আরো কয়েক ঘন্টা বেশি ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয়েছে। আবার ক্লাস করার উপযোগী একটি শান্তিপূর্ণ আরামদায়ক জায়গাও তাদের প্রয়োজন ছিল , যেখানে কেউ তাদের পাঠ গ্রহণে বিঘ্ন ঘটাবে না বা বিরক্ত করবে না। আমাদের মতো গরিব দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদেরই পরিবারের সকলে মিলে থাকার জন্য একটি সাধারণ ঘর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেই। প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত ছোট বাড়িতে থাকেন, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ক্লাস করার উপযোগী একটি নিভৃত শান্তিপূর্ণ জায়গা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বহু পরিবার সকলে মিলে 12/14 ফুটের একটিমাত্র ঘরে বসবাস করেন । তাদের পক্ষে করোনাকালীন বিধিমাফিক সামাজিক দূরত্বই ঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। অনলাইন ক্লাসের উপযুক্ত পরিবেশ আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নেই বললেই হয়।

একে তো অনলাইন ক্লাস চালানোর মতো সামাজিক পরিকাঠামো আমাদের নেই; তার উপরে আবার দোসর হয়েছিল আম্ফানের তান্ডব। বৈদ্যুতিক পরিষেবা এবং নেট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল এর ফলে। ঘূর্ণিঝড়ের আগে এবং পরে গাছ তলায় বসে ক্লাস করতে হয়েছে, এমন ঘটনাও শোনা গেছে। আবার একই সঙ্গে বলতে হয় যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই নেট সংযোগ রক্ষা করার জন্য ভিডিও বন্ধ রাখতে হয়।শুধুমাত্র অডিও মাধ্যমে শুনে ক্লাস করতে হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের। অন্যদিকে শিক্ষকেরাও প্রায় কোনক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মুখটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেননি। এমনকি আরো ভয়াবহ বিষয় হল এই যে ,শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত অপরিসর স্থানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ক্লাস করতে গিয়ে, নিজেদের অডিও পর্যন্ত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে, যাতে তাদের চারপাশের প্রতিদিনের গৃহস্থালির জীবনের শব্দগুলি ক্লাসের সর্বসমক্ষে না পৌঁছয়। যদিও বেশির ভাগ শিক্ষার্থী শুরুতে অনলাইন ক্লাস অংশ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তবে সংখ্যাটি ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। অনলাইন ক্লাসগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের বীতরাগ সৃষ্টি করেছে। অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটেছে অনেক। কেরালার দশম শ্রেণীতে পাঠরত এক ছাত্রী অনলাইন ক্লাসে যোগ দেওয়ার উপায় না পেয়ে অবসাদে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনাটি মূলত শিক্ষার মৌলিক অধিকার এবং অনলাইন শিক্ষার বৈষম্যের দিকগুলিকে তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়ই, তার সঙ্গেই করোনাকালের শিক্ষার্থীদের মানসিক সংকটের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হলে , সমাজে সার্বিক ভাবে এর জন্য উন্নত পরিকাঠামো দরকার এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রকে সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার্থীদের ড্রপ আউট এর সংখ্যা শোচনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। অনলাইন ক্লাসগুলির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়পক্ষকেই এসম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন । বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে। যেহেতু কোভিড19 বিশ্বজুড়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে, তাই ভার্চুয়াল দুনিয়ায় অনলাইন শিক্ষা একটি বিকল্প পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই নানা স্তরের সমালোচনা সত্ত্বেও অনলাইন শিক্ষা প্রত্যক্ষ শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বিকল্প ব্যবস্থা থেকে সকলেই আশু মুক্তি চায় কিন্তু এখনই এই ব্যবস্থা থেকে একশভাগ মুক্তি ঘটবে কিনা, সে কথা কেউ জানে না । অনলাইন শিক্ষা একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা, কিন্তু তাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই।

Effects of Covid-19 Pandemic on the Environment

Shriparna Bagh; (Semester VI, Department of Zoology)

Coronaviruses are the well known causes of severe respiratory, enteric and systemic infections in a wide range of animal hosts including man. The outbreak of Covid-19 (SARS-COV-2) was initiated in Wuhan and it was soon declared a "Public Health Emergency of International Concern" by WHO.

The world has changed in the last few years due to the rare disaster Coronavirus. The pandemic has resulted in the loss of a large number of human lives. To prevent the spread of the pandemic, the whole world was put in a great lockdown. Our lives suffered many changes during the lockdown and the environment was impacted in myriad ways. Here are both the positive and negative effects of Covid-19 reflected on the environment and the climate.

POSITIVE CONSEQUENCES: It is noticed that there is a sudden reduction of GreenHouse Gas emission as industries, transportation had shut down during a certain period of time. Air pollution had also decreased as the movement of vehicles was restricted. It was computed that nearly 50% reduction of N_2O and CO occurred due to the shutdown of industries and also in the burning of fossil fuel in countries like the USA, Canada, China, India, Italy, Brazil etc.

In many countries worldwide, flights were cancelled as international travel was restricted. In India alone, 36% drop in air travel led to a massive change in the environment. It is an enormous help to withstand and resist global climate change as it conserved precious fossil fuel.

Furthermore, water pollution is a common disaster in countries like India and Bangladesh where industrial and household wastes are dumped into rivers without any procedure. This reduced to a great extent as industries were shut down during the pandemic. The rivers Ganga and Yamuna did reach a significant level of purity in India. Likewise, there was a sharp decline in noise pollution and many beaches were cleaned around the world. Many animal species were seen back in urban spaces after long.

NEGATIVE EFFECTS: On the other hand, coronavirus pandemic has some negative impacts that may continue for long periods in the future. Since the outbreak, medical waste generation has increased globally which is a major threat to public health and environment. For sample collection of Covid-19 patients, their treatment and for disinfection purposes, a massive amount of infectious biochemical waste is generated from hospitals and clinics around the world.

According to recent published studies, it has been reported that the SARS-COV-2 virus can live for a day on cardboard and upto three days on plastic and stainless steel. So waste generated from hospitals (needles, syringes, masks, bandages, masks, used tissues) should be managed properly to reduce further infection and environmental pollution.

To protect themselves from the viral infection, people are using masks, gloves, PPE, most of which are plastic based. But due to the lack of knowledge about infectious waste management, most people dump these in open places which clog waterways and worsen environmental pollution.

Recently a huge amount of disinfectant is used on roads, on commercial and residential areas to exterminate the virus. However these disinfectants may also kill non-targeted species leading to ecological imbalance. Moreover SARS-COV-2 virus was detected in Covid-19 patients' faeces and also from municipal waste water.

CONCLUSION: It is assumed that all these environmental consequences are short term. But it is high time to scheme a proper strategy for long term benefit as well as sustainable environmental management.

Some possible strategies like sustainable industrialisation, use of green and public transport, use of renewable energy, waste water treatment and recycling, ecological restoration and ecotourism can be taken up for global environmental sustainability. United time-oriented effort can positively lessen the impact of the pandemic on the environment.

গার্হস্থ হিংসা ও লকডাউন

পারমিতা ভাণ্ডারী, (স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, ২০১৯- ২০)

করোনা মহামারীর জন্য দেশে দেশে দেখা গেছে লকডাউন।আর এরই ফলে দেখা গেছে বেকারত্বের হারবৃদ্ধি আর অর্থনৈতিক কারণে অভাব অনটন, যার জন্য মানুষের মধ্যে এক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।তবে দেশে গার্হস্থ জীবনের সমস্যা বরাবরই, তা অজানা নয়। এরই মধ্যে করোনা মহামারীর প্রভাবে এই গার্হস্থ হিংসার চেহারা আরো ভীষণ হয়েছে। শুধু আমাদের দেশেই নয় , এ মহামারী বিশ্বব্যাপী, যার ফলে বিশ্বজুড়ে সবাইকে এক শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এই শোচনীয় অবস্থার জন্যও গৃহবন্দী মেয়েদের বেশি করে হিংসার শিকার হতে হয়েছে। আমাদের দেশে মেয়েদের হীন চোখে দেখা হয় , আজ নয়, বহু বহু যুগ ধরেই।তবে উনিশ শতকের নারীরা অনেকটা ডানা মেলতে শুরু করেছিল।তারা স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছিল। সেই জন্যই তো কাদম্বিনী বসু, সরলা দেবীর মতো অজস্র মহীয়সী নারীর দেখা পেয়েছি আমরা।তাঁরা বুঝিয়েছিলেন ,শুধু গৃহে নয়, বাইরেও নারীর জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু এঁরা উনিশ এবং বিশ শতকের ব্যতিক্রমী নারী। সমাজের মূল ধারায় সেদিন এবং আজও মেয়েরা পুরুষতন্ত্রের দ্বারা যথেচ্ছ পেষণ সহ্য করেই আসছিলেন।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা!"

কিছু পুরুষেরা মনে করতেন নারীর জন্য সমাজের কোনো অধিকার থাকারই কথা নয়; তাদের কোনো আশা আখাঙ্ক্ষা নেই, কেবল পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য, সন্তান ধারণ করা ও লালন পালন করার জন্যই তাদের জন্ম; সংসারের সুখের জন্য মঙ্গল কামনা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তাদের।অথচ, আজ প্রমাণিত যে মেয়েরাও পারে পুরুষের সঙ্গে

সমান তালে তাল মিলিয়ে চলতে-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে একবিংশ শতক পর্যন্ত মেয়েদের অগ্রগতি কম ঘটেনি । জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমানে সমানে নিজের মেধা এবং সৃষ্টিশীলতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে মেয়েরা। কিন্তু এরই মাঝখানে করোনার অতিমারীর থাবা, বিশ্বকে আক্রান্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের সামাজিক পারিবারিক জীবনে অনেক ক্লেশ ডেকে এনেছে।যেখানে লকডাউনের ফলে রেডজোন দেখা গিয়েছে সেখানে ঘর থেকে বাইরে বার হবার

উপায় ছিলনা।এর ফলে পারিবারিক সমস্যা বেড়েছে ঘরে ঘরে। হেনস্থা হতে হচ্ছে বাড়ির মহিলাদের। বিশেষত উত্তরপ্রদশের মাহোব, লখনউ, চিত্রকূট প্রভৃতি জায়গায় মহিলাদের গার্হস্থ হিংসার শিকার হতে হচ্ছে প্রতিদিন।

মহামারীর আগে ও পরে বহু বহু মেয়েদের প্রাণ দিতে হয়েছে,স্বামীর হাতে মারখেতে হয়েছে কাউকে বিষময় মদের জন্য টাকার যোগান না দেওয়ায়; আবার কেউ প্রতারণার শিকার হয়ে প্রেমিকের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, কোথাও বা গর্ভবতীর গর্ভপাতও ঘটেছে। কেউ তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তাকেও মারখেতে হয়েছে ; না খেতে পেয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে সারাটা দিন। আজও এই পুরুষদের জন্য মেয়েরা ঘৃণায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। এই লকডাউনে বাইরে মেয়েদের আর হেনস্থা করতে না পেরে ঘরের মেয়েদের প্রতি পুরুষেরা যথেচ্ছ নিপীড়ন চালিয়েছে। এর কারণ অনেক সময়ই অভাব ও অর্থনতিক সমস্যা জনিত হতাশা।গার্হস্থ হিংসার প্রভাব শুধু বাড়ির মহিলাদের ওপর পড়ছে তা নয় , শিশুদের ওপরেও এর প্রভাব অনেকখানি ফেলেছে। শিশুদের উপরে করোনা ভাইরাস তুলনায় কম প্রভাব ফেললেও, গার্হস্থ হিংসার শিকার হতে হচ্ছে তাদের বহুসময়ই।আর লকডাউনে স্কুল ও কলেজ বন্ধ। তাই এদের চোখে মুখে একটা মানসিক চাপের ছাপ বিশেষভাবে দেখা যায়।

তবে মহিলাদেরই গার্হস্থ জীবনের হিংসার শিকার হতে হয় বারেবারে। একবিংশ শতকে মহিলারা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হলেও এই মহামারীর জন্য হিংসার শিকার হতে হচ্ছে।তাদের বেরিয়ে আসতে হবে রাহুর গ্রাস থেকে। অপরাধীরা বাইরে না বার হতে পেরে গৃহবন্দী থাকাকালীন পরিবারের ওপরেই অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে ; অত্যাচার চালাচ্ছে ঘরের মেয়েটির ওপর ।

এখন একবিংশ শতাব্দীতে মহিলারা পিছিয়ে নেই নিশ্চয়ই। তারাও উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে জানে, নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে জানে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ । তাই তার মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয় কমিশনের কাছে। এতদিন শুধু মেয়েদের বাইরে হিংসার শিকার হওয়ার জন্য অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছিল , তবে ঘরের যে মহিলাটি চুপ করে থাকত, সে আজ অভিযোগ করতে শিখে গিয়েছে, তা দেখে কমিশন, পুলিশ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ উৎসাহের সঙ্গে তাদের অভিযোগটি গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং তাদের দিকে যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ।

সূর্য যেমন অস্ত যাবার পর আবারও আলো দেয়, তেমনিই ঘরের মহিলারা গার্হস্থ হিংসার শিকার হলেও সেই সূর্যের প্রথম কিরণের মত বেরিয়ে আসতে পারে এবং বলতে পারে–

"... বেদনার যুগ মানুষের যুগ , সাম্যের যুগ আজি

কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি..."।

Lockdown And Increase In Domestic Violence

Mohini Mitra, B.Sc. (Geography) ,Semester 4.

I was waiting for him to come home, preparing a hot meal which was perfect in every way, trying my best to set the table and do other home chores on time so his mood won't be off. Making sure the home looked clean was always a concern for me because I am always asked this one question; what do you do except sitting and sleeping all day at home?! At last he came home, I asked my child not to make any noise as he would be tired working all day for us. The dinner was still hot, so I served it on the table for him. He took the first bite, may be he wasn't hungry, may be he doesn't like it, I still don't know what was the reason that after just one bite the whole plate was thrown at my face in front of my 4 year old boy, who understands everything. I was in shock and my kid was in shock. He couldn't even speak a word and all everyone heard that night were his loud taunts and complaints about how I was a bad wife who can't cook, who can't manage home or a kid or anything.

I still don't know if it was the food that triggered it but till date I am afraid to make Chicken butter masala again.

My kid who is a teenager now shouts at me too, hits everyone at school but stays quiet in front of his father and just looks at him with empty eyes.

But I still love him, why wouldn't I? He is my husband and the father of my child. Family violence refers to threatening or other violent behaviors within families that may be physical, sexual, psychological, or economic, and can include child abuse and intimate partner violence. Family violence during pandemic is associated with a range of factors including economic stress, disaster-related instability, increased exposure to exploitative relationships, and reduced options for support. Due to the social isolation measures implemented across the globe to help reduce the spread of COVID-19, people living in volatile situations of family violence are restricted to their homes. Social isolation exacerbates personal and collective vulnerabilities while limiting accessible and familiar support options.

Since women found no respite and were confined to the walls of the house with their abusers during the lockdown period, the incidence of domestic abuse went up. What are the causes of domestic abuse in India? Lack of gender sensitization,misogyny, patriarchal attitudes and lack of healthy relationship models are most common reasons for violence against women. Socio economic status, substance and alcohol abuse also leads to violence against women. Children who are subjected to abuse are likely to behave similarly to adults. Sometimes children,who witness one parent abusing the other, tend to abuse in later life. Now, of course people can argue that there are prevalent laws in the Indian Constitution. But the situation is much more complex than we can imagine. Especially for those who are economically dependent or have nowhere to go. We have to thrash patriarchal society. Strengthening the laws and supporting and being compassionate to the survivors. "If we are to fight discrimination and injustice against women we must start from the home for if a woman cannot be safe in her own house then she cannot be expected to feel safe anywhere."

অতিমারী : যুবসমাজের চাপ ও উদ্বেগ

চম্পা দেবনাথ, (বাংলা সাম্মানিক, ষষ্ঠ সেমেস্টার 2020 -21)

কোন রাষ্ট্র বা জাতির সমৃদ্ধির চাবিকাঠি গচ্ছিত থাকে সেই জাতির যুব সমাজের হাতে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কোভিড অতিমারীর ভয়াবহ প্রকোপের ফলে সেই যুবসমাজই দিশাহীন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়েছিল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে , সংগত কারণেই যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র মানসিক চাপ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত যেসব তরুণ তরুণী নিজেদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে, পেশাগত জীবনে প্রবেশ করতে চলেছেন, তাদের মধ্যে হতাশা এবং উদ্বেগের সীমা নেই। এই বিশেষ কোভিড পরিস্থিতিতে গোটা পৃথিবীতেই, ভারতবর্ষে তো বটেই, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের রোজগার হারিয়েছেন। আবার মহামারী পরিস্থিতিতে দিনের পর দিন একটানা বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হওয়ার ফলে, পেশাগত জীবনে প্রবেশের আগে যে প্রফেশনাল ট্রেনিং প্রয়োজন হয়, অনেকে সেই সুযোগ গ্রহণ করতেই পারেনি। চাকরির বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে চলেছে। এদিকে প্রতিনিয়তই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের উপর পরিবারের স্বজন- পরিজন মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলেও, ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অথবা চাকরির সম্ভাবনা পায়ে পায়ে হোঁচট খাচ্ছে। ফলে বহু পরিবারেই এই মহামারী উত্তর- কালে তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। এই সার্বিক হতাশা- জনক পরিস্থিতি তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্থিতিকে বহু ক্ষেত্রেই বিচলিত করেছে। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যেন পা বাড়িয়ে আছে তারা।

এমন বহু তরুণ-তরুণীর কথা আমি জানি, যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘদিন ধরে কোন একটি শিল্পের চর্চা করে এসেছেন এবং ঐ শিল্পকেই তাঁরা তাঁদের বৃত্তি হিসেবেও বেছে নিতে চান। কিন্তু নৃত্য- গীত- চিত্রাঙ্কন, যেটিকেই তিনি নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চাইছেন , এই লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধা আসছে সেখানে-সেখানেই। অধিকাংশ পরিবারের কোন একজন অভিভাবক চাকরি খুইয়েছেন, কারো বা আগের উপার্জনে পরিমাণে টান পড়েছে। এইসব অভিভাবকেরা তাদের সন্তানকে দুবেলা খাইয়ে- পরিয়ে তাদের পড়াশুনো চালাতেই হিমশিম খাচ্ছেন; অতএব এর উপর আবার নাচ-গান- ছবি আঁকা শেখানোর খরচ যোগাড় করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে। সে কারণেই, যেসব তরুণতরুণী গান- নাচ- আঁকা শিখিয়ে কিছু উপার্জনের চেষ্টা করতেন, তাদের কাছে ছাত্রছাত্রী আসছে নামমাত্রই।এইভাবে তরুণসমাজ তো একটা বিরাট অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেই, গোটা সমাজেই সেই অন্ধকার ছেয়ে এসেছে।

লকডাউনের জন্য জীবন জীবিকার অনিশ্চয়তা আর সেই সঙ্গেই অনলাইন পড়াশোনা ও পরীক্ষার ফলে সেই রেজাল্ট নিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অপেক্ষা করা, এইসব মিলিয়ে তরুণ সমাজের মনে অনিবার্য এক আশাহীনতা তৈরি হয়েছে। তবু ব্যক্তিগত এইসব ক্লান্তি এবং হতাশার মধ্যেও সমাজের নানা ক্ষেত্রে তরুণ সমাজই নানা জনসেবা মূলক প্রকল্পে যুক্ত হয়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন এলাকায় কোভিড রোগীদের দিকে সহায়তা ও শুশ্রূষার হাত বাড়িয়ে চলেছে। পরিশেষে এটাই বলার যে, তরুণ প্রজন্মের মনে নতুন করে আশা জাগিয়ে তুলে, তাদের জন্য একটি সুস্থ ও সম্পন্ন ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজকেই নিতে হবে।

Women workers in the unorganised sector of India and the Pandemic.

Sutapa Mukhopadhyay,Dept of History

Anong was acquainted with me for a long time. She had a unique culinary skill and came to India from Thailand to get a job in the related sector. She worked as a Thai chef in a renowned hotel of Kolkata. During the lockdown period in 2020 she lost her job and was forced to go back to her native state. This year she came back again in search for a job, but to no avail. She once called me and talked to me about the ordeal she is facing. This is the scenario of the unorganised sector of India. Losing one's job at a fraction of a second is nothing but hard reality in the informal employment sector of India.

In most of the developing countries widespread unemployment poses varied problems for the working women and India is no exception. The worldwide pandemic has enhanced the hardship for everybody barring his or her gender. The lockdown to contain the spread of the coronavirus brought about a devastating impact on the Indian labour market. There is no denying the fact that the women workers face additional hurdles in the job market. The International Labour Organisation's Global Wage Report 2020-2021 states that the impact of the crisis stemmed from Covid-19 had been different for men and women. An estimated 400 million unorganised sector workers in India are at risk of dire poverty and the women workers are worst-affected. Discrimination, low pay, lack of recognition, harassments are certain factors which create difficulties for women to sustain in the job market. The gender gaps in the labour market had increased during the pandemic period. Moreover the women's burden of domestic chores has increased during the pandemic period which forced many of them to stay away from the job market. Periodic Labour Force Survey of 2018-19 shows that the share of women engaged in domestic and allied activity together was 57.4 percent and 60 per cent compared to just 0.5 per cent 0.6 per cent for men in rural and urban areas respectively. The onus of child-rearing on women reduced the women workers participation in the job market. Their prime responsibility as caregivers and their unpaid care work had increased in the lockdown period. Even the self- employed women who worked from within their household premises do not enjoy any social security benefits.

Dr. Arun Kumar, CEO of Apnalaya, an NGO says, "Whenever there is a huge level of unemployment, women get further marginalised. One reason is because the tendency on the supply side is that men will go out and work. In terms of demand, people prefer male labour force first." In the unorganised job market, women are largely concentrated in domestic work. The negative economic impact of the lockdown is being felt by the women of this sector. The survey made by the Institute of Social Studies, April-May 2020, shows that the women workers in the domestic work sector had faced a huge loss of income. Covid-19 is intensifying inequalities and women continue to bear the maximum brunt. Women workers in the informal sector face different structural constraints. Women in poor households work in categories of work such as domestic work, home-based work, street vending, construction work etc. Agriculture is the largest provider of employment followed by manufacturing, public administration, health, education, trade, hotel etc. Women workers comprise the largest group of landless labourers. They work on daily wage basis. All these sectors have been affected and hit hard by the pandemic. The ISST survey shows that around 83 percent of women workers faced severe income drop. Nine out of ten women informal workers stated that the pandemic has increased anxiety and mental stress due to uncertainties of work. They are suffering from challenges in procuring food items and managing their children's education.

There is no denying the fact that before the pandemic era, workforce participation rates for women were declining in India. And the impact of the pandemic on women workers is devastating. Today's world of work is still marked by gender inequality. Women face a number of structural constraints in the informal job sector. The informal workers provide many essential services, but they do not have any social protection to deal with such precarious situation. Although the Union and the state governments of India have announced some relief packages, the effective implementation of the welfare measures poses a big challenge. Following the recommendation of the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector 2006, extending social security to informal women workers is the need of the hour.

Sources:

1. International Labour Organization Global Wage Report 2020-21.
2. NCEUS Report 2006.
3. Periodic Labour Force Survey 2018-19.
4. Do, 2019-2020.
5. Nirmala Banerji, Indian Women in a Changing Industrial Scenario, Sage Publications, New Delhi, 1990.
6. Rameshwari Pandya and Sarika Patel, Women in the Unorganized sector of India, New Century Publications, New Delhi, 2010
7. Renana Jhabvala and R.K.A. Subrahmanya, The Unorganised Sector: Work Security and Social Protection. Sage Publications, New Delhi, 2000
8. Renana Jhabvala, Ratna M. Sudarshan, Jeemol Unni eds., Informal Economy Centrestage: New Structures of Employment, Sage Publications, New Delhi, 2003.
9. Shiney Chakraborty, "Women Informal Workers: Falling Through the Cracks in the Pandemic", Institute of Social Studies Trust, New Delhi, 2021.

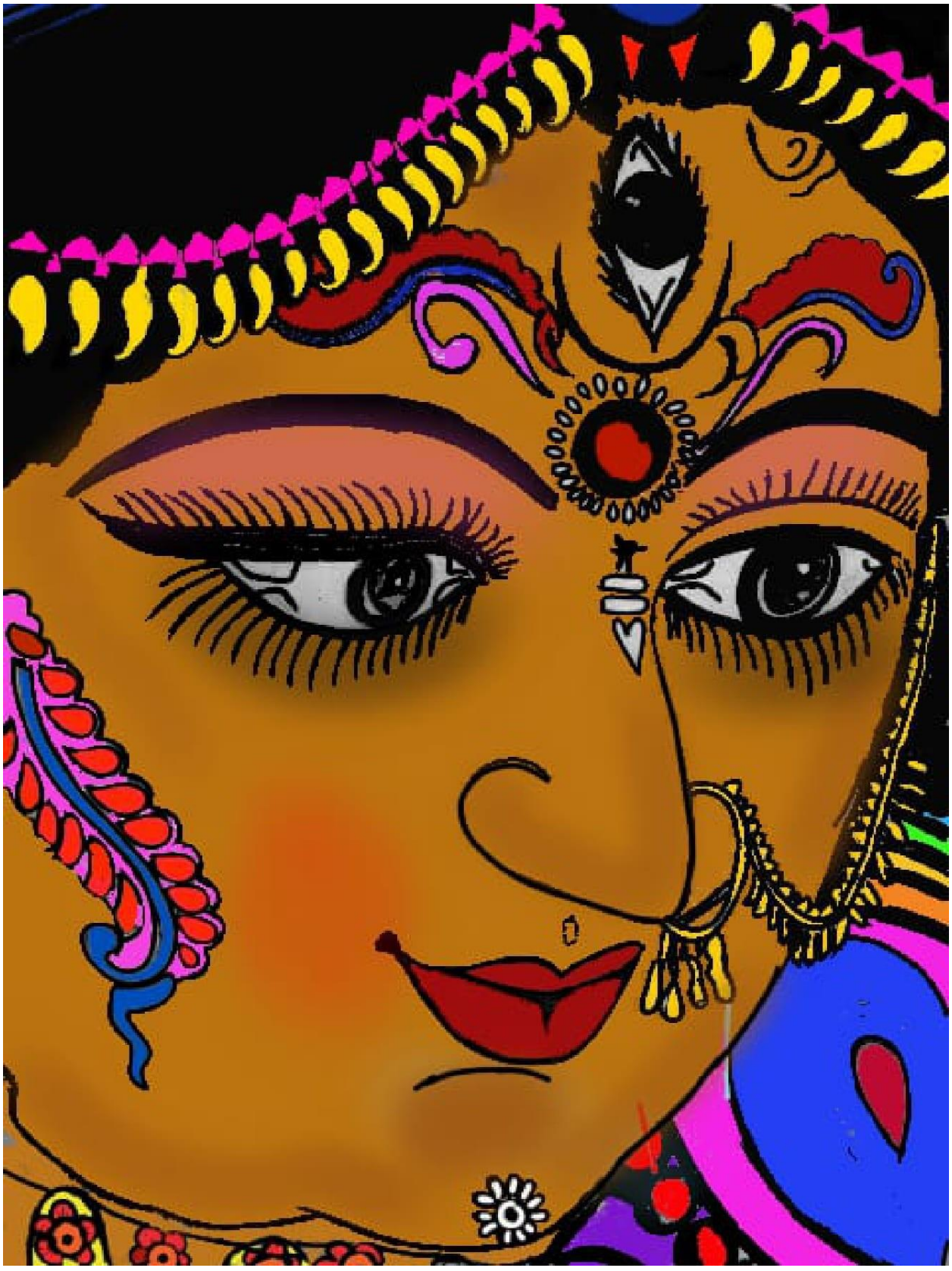

লম্বা ছুটি

সুমন চক্রবর্তী, ইতিহাস সাম্মানিক

মনে পড়ে বন্ধুরা, স্কুল-ফিরতি সেইসব দিনের কথা !

চারটেতে ছুটি হলেও সাড়ে চারটেতে গড়িয়ে পড়া সেই আড্ডা

এই তো সেদিনও ফিরতি পথে ঝমঝম বৃষ্টিতে সবাই মিলে ভিজেছি কত

বাড়ি ফেরার সহজ পথ বাতিল করে

কত কত ঘুরে ফিরেছি ঘরের দরজায়

গলায় আমাদের সবে শেখা হিন্দিগানের সুর , খুশিয়াল

আর সেখানে ফেরার অবকাশ নেই আজ

আজ এক লম্বা ছুটি নিয়ে বসে আছি সবাই

তবু এ ছুটির শরীরে মুক্তির ঘ্রাণ নেই ছিটেফোঁটাও,

আদিগন্ত খুশি নেই।

TEAMWORK

Arpita Sen, Bcom (H), Sem 4

"Coming together is the beginning,
Stay together is progress,
Working together is success!!!"

Teamwork is when a great of people comes together to complete the tasks enrolled to them. It's one of the basic need or necessity for any organization to achieve all its goals.

"Surrender the ME for the WE"

Each organization is divided into various sections. All the parts of the organization do teamwork and complete the various tasks assigned to them. If there is no teamwork organization fails to achieve their estimated goals.
"One spirit, one team, one win"

One of the most significant advantages of working in a team is that the work gets divided between all the group members. When the work is shared, all the members are going too equal amount of jobs. Hence, no one has to feel overburdened with the task assigned to them.

"Teamwork; We believe in each other."

A critical lesson that school teach is the lesson on teamwork. All the that you play based on teamwork as cricket, volleyball etc..
"11 players, 1 heartbeat
1 team, 1 mission"

Teamwork teaches us an important lesson in our daily life i.s. trust or believe in each other. Every relationship works because of the efforts of two people working together as a team.

"You may be strong but we are stronger"

You may be able to do everything alone but then a team will increase your trust in yourself, your spirit, your strength and you will be boosted up.

"There is no I in team"

Every relationship works because of the efforts of two people working as a team “One team, one dream” When everyone works in teams, they achieve all the goals on which the organization functions. It makes things easier for everyone in the team.

“We are all in this together”

Teamwork is the collaborative effort to achieve a common goal or to complete a task in more effective and in more efficient way. Creativity is not the domain of one single person. Beside a bigger pool of ideas, working together also creates an enthusiasm for idea generation that people usually don’t experience alone.

“Together Everyone achieves more”

Teamwork is becoming increasingly important in contemporary organization, and as long as teams are formed, managed and implemented effectively can provide a source of competitive advantages.

“Teamwork makes the dream work”

FIFTEEN

Mohini Mitra, BSc (Geography),Semester 4

The colourful bangles sparkled in the sunlight, reflecting it and casting a hundred flecked rainbows all over the stall. I felt Mariam's tiny hand, clasped tightly in my stronger and rougher one tug excitedly. My knee high little girl's eyes were wide, sheer amazement reflected in them as she took the melange of colours: left, right, up and down. I chucked when she looked at me, awestruck. "Appa!" She was almost whispering. I bent down, - "Say"
I looked much bemused.

"Ammi loved blue bangles."

The blue bangles were so pretty, I silently agreed as I glanced at them with more careful interest. Sharia would have loved them. I sadly pushed the thought away from my mind.

Mariam was gasping again. Coming back from my reverie, I saw her delightedly staring at the tiny blue bangles that an equally delighted shopkeeper was holding out to her.

The scene was so chemical that I burst out laughing. She turned to me, euphoria written all over her innocent face and breathlessly asked, "Appa? Will I wear it?"

The shopkeeper's eyes crinkled with merry laughter gently taking her wrist he slipped the bangles through. Mariam gazed joyfully at her five year old hands.

"How do you like it my dear?" The vendor asked.
My daughter looked at me, her shining eyes waiting for a reply which I promptly gave.
"They looked just perfect."
A beaming Mariam looked on while a deal was made and a set of fifteen blue bangles was bought. When I saw her staring wondrously at a red bangle. I quickly took her hand and dragged her out, leaving the storekeeper doubled up with laughter.

We headed homeward, each of us sucking on an ice - lolly in the heat, Mariam holding my hand tightly with one of hers and the ice lolly in the other, precious

bangles already worn on her wrist. Suddenly, the sky shadowed over. Planes - their rotating blades creating a dreadful din.

And that was when we heard the bomb fall a little distance away.
"Appa!"
Mariam was frightened and rightfully so. I scooped her up in my arms and ran in the direction opposite to the blast. People were shouting on the street, scrambling to find a safe haven.
Huh! Safe haven! In war - plagued Syria where was this safety? Our lives were always precariously on the brink of death.
Bang! Bang!
Another blast shattered the air. Then, all of a sudden, the first gunshot was heard. Someone screamed. A moment of silence followed before the gunfire erupted all around and people ran helter - shelter searching for cover. Spotting the abandoned stall of bangles a few meters away, I fell to the ground - Mariam's arm around my neck - I had to crawl to its shelves and racks somehow.
Selecting the most sheltered wooden Almirah, I managed to wedge myself behind it. Here, my daughter and I sat for the next few hours, hearing the shots, cries and thud. Shards of glass exploded as this stall, like every other one in the market, was fired at. On and on the attack dragged, until the screaming lessened and the bombing faded away into silence again.
Miracle of miracles! We were still alive, I don't know how long we sat there. When night fell and I was fairly certain that the attackers were there no more, I cautiously stepped out, leaving a pale Mariam still in the stall's shelter. All I could see in soft moonlight were bodies lying on the cold ground, rubble, debris, lifeless eyes and littered glass splinters. Destruction. I stifled a sob. Our home? Gone. Now where? Vision blurred. I gently picked up my girl and headed out. There was only one thing left for us to do - go to the docks and flee. We walked in silence. Sadness gnawed at my stomach.
"Appa?"
" Haan?" I choked
She held out her arm, which bore fourteen blue bangles.
"One broke", she whispered, before she buried her face into my neck and cried, body wracked with silent sobs.
My heart ached, but what could I do? So I only hugged her tighter. We reached the dock soon, where a small group of people had already gathered. Taking the nearest, sturdiest fishing boat and bare minimum food and clothes, we sailed. England was taking refugees, I heard someone saying.

All I could do when Mariam fell asleep on my lap was to stare at the vast unending ocean all around, realizing how powerless I was to protect her from it. Only god could save us now.

Days went by. On the fourth day, Mariam showed me that only ten bangles now remained on her wrist. Food was already running out.

It was on the sixth day that someone first died. He was a mere guy of eighteen, weakened by pneumonia. His mother wailed and fell over her lifeless son begging him to open his eyes.

Needless to say, he did not. Eventually, despite the mother's anguish, they threw his body into the cold water. There was nothing that could be done and space after all was strained.

On the seventh day, his mother could not be found on the boat. She had jumped into the river during the night. One by one, my Mariam's treasured, blue bangles broke. And as each bangle broke, I felt our resolve also crumbling away bit by bit. Finally, only three remained.

I had almost given up hoping for survival. Thus on a scorching day when we realised that we had almost made it, people went berserk with joy.
Strength renewed by hope, willing hands helped the boat speed to the coast.

England! At last!

We all were insane with gratitude when he alighted - people weakly hugged while some completely collapsed with fatigue.

The bomb shell which hit us next was metaphorical and worse and a scene of cruelty.
"No more refugees! Do you not understand?", a soldier was barking in anger.
How many of your war - torn population "do you expect our already overcrowded country to sustain? It's state's decision."

I could hear his voice faltering with guilt but he had his orders to follow.
Mariam and I stood a little distance away. My mind was in a whirl for everything I had held onto had fallen away.

I wailed in deep grief as I remembered the day we had been in the rainbow adorned bangle stall. But what about my daughter, who had flecked my life with her rainbows of joie de vivre?

"Appa?" A gentle tug on my tattered dirty shirt.
She held out her wrist. Two bangles still glistened.
"One for you and one for me," she whispered -
Maybe God's wish of making us still survive.

Today, if you go to the same spot on that coast, maybe you will find two blue bangles buried deep in the sand.

বিস্ময়

অর্ণব চৌধুরী

আর কাকে হতে হবে অমর অক্ষয়
এ সভ্যতা লকলকে, সারাদিন ভয়
সারিসারি মানুষের রতিময় চোখ
গাছে গাছে লেখা থাকে ‘ যাত্রা শুভ হোক’!
সুগন্ধী মেখেছ মেয়ে, চোখ ক্যামেরায়
পিছনে লোকনাথ বাবা, দুবাহু বাড়ায়
পিতা কি কন্যার ঠোঁটে ঢেলে দেয় বিষ
পিতা কি পুত্রের চোখে জাগে অহর্নিশ!
কেন তবে হতে হবে তোমাকে অক্ষয়
কালবেলা আছড়ে পড়ে ঘুম ঘন হয়
রান্না ঘরে তোলা থাকে কাদের সংসার
গঙ্গার বাতাস ঢোকে, চোখে কাঁটাতার—
আর কিছু নেই শুধু সন্ধ্যা নামে ধীরে
একরাশ পাতা ঝরে এখন শরীরে

আমাকে নেবাতে পারে এত শক্তি রাখে না সময়': নবনীতা দেবসেন

ড. সুদক্ষিণা ঘোষ , এসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ।

কুমারী বীণাপাণি বিপণি দেব। নিজের নাম হিসেবে এই নামটাই পছন্দ করেছিল এক বালিকা। ইস্কুলের সমস্ত বই-খাতার মলাটে পুরোনো নাম কেটে কেটে লিখে রেখেছিল নিজের দেওয়া এই নতুন নামটা। রীতিমতো মহার্ঘ্য একটা নাম কিন্তু ছিলই তার ।মহার্ঘ্য, কারণ নামকরণটি করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তবু নিজের সে- নাম একেবারেই মনে ধরে নি ছোটো মেয়েটির । সে- নামের উচ্চারণে যে কোন ছবি জাগে না তার মনে, কোন বাজনা বাজে না কানে! অথচ রঙে রেখায় ছন্দে জড়িয়ে সে -সবই তো সে খুঁজে পায় স্বনির্বাচিত এই নামটার সৌন্দর্যে আর ঝঙ্কারে, সারাদিন কানের মধ্যে গুনগুন করে গানের মতো বেজে চলে এই নামটাই ।

তবে ,এটাও ঠিক, 'বিপণি' শব্দটার মানেটা যে ঠিক কী, সেটা তখনও জানত না সে, আর এটাও বলাই বাহুল্য যে, এর পরেও, বীণাপাণি বিপণি নামে চেনা দোকানটি যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেল হাজরার মোড়ে, আর ছোট্ট মেয়ের স্বরচিত এই নামটি তুমুল হাসির এক গল্প হয়েই রয়ে গেল পারিবারিক স্মৃতির পরিসরে, ছোটো মেয়েটি বড়ো হয়ে উঠতে লাগল রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম 'নবনীতা'কে সঙ্গী করেই।

ওই একবারই নয় কিন্তু, নামকরণকে ঘিরে এমন চুপি চুপি বিচিত্র বিদ্রোহের আয়োজন আর একবারও করেছিল ওই মেয়েটাই ; সেবারে শুধু বাবাকেও তার ওই গোপন বিদ্রোহের শরিক করতে চেয়েছিল সে আর তাই খুব চুপি চুপিই বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিল 'নির্মলা' নামে। ওই চিঠিতেই জানিয়েছিল, এখন থেকে বাবা যেন এ- নামেই সম্ভাষণ করেন তাকে, তবে, শর্ত ছিল ওই একটাই , ডাকতে হবে চুপি চুপি, সবার অগোচরে।

মেয়ের কথা কি রাখেননি বাবা ? রেখেছিলেন তো, মেয়ের দাবি মেনে সম্ভাষণ করেছিলেন তাকে 'নির্মলা' নামেই, তবু যে মেয়ের এই পরিকল্পনাটিও পৌঁছে গেল ওইরকম এক তুমুল হাসির গল্পের পারিবারিক পরিসরেই, তার জন্য দায়ী অবশ্য বাবা নরেন্দ্র দেব-এর হাতে লেখা ঠিকানাটাই। মেয়েকে লেখা চিঠির ঠিকানাতেই যদি এত বড়ো বড়ো করে মেয়ের স্বেচ্ছা- নির্বাচিত ওই নামখানি মুদ্রিত করে দেন বাবা, বিশ্বসংসারে কার তবে আর জানতে বাকি থাকে মেয়ের ওই একান্ত গোপন কথাটি?

সে কথাই লিখেছিলেন নবনীতা তাঁর 'শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর' নামে এক লেখায়, আর বাবার এই যুগপৎ অনুরোধ-রক্ষা আর বিশ্বাসভঙ্গের গল্প শোনাতে শোনাতে অনায়াসেই বলে উঠেছিলেন, ছেলেদের যে বিশ্বাস করতে নেই, সেটা ওই অভিজ্ঞতার পরে ওই বালিকাবয়সেই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল তাঁর।

নবনীতা দেবসেন নামে লেখিকা টির ছদ্মকোপের এই উচ্চারণটির দিকে চেয়ে হয়তো তাঁর জীবন চরিতের অনেকগুলো পাতাই উল্টে যায় তাঁর কোনো কোনো পাঠকের মনের ভিতরে, মনে হয়, কৌতুকের আবরণে মুড়ে জীবনের গভীরতম ব্যথাকে প্রকাশ করবার এমন অসামান্য শিল্পসিদ্ধি এত অনায়াসে আয়ত্ত করেছেন বলেই কি

আমাদের চোখে এত নির্ভার লাগে তাঁর গল্পের জগৎ, এতটাই নির্ভার যে বিদেশ -বিভুঁইয়ে মালপত্তর- ট্রাভেলার্স চেক- টিকিট এমনকি পাসপোর্ট পর্যন্ত হারিয়ে ফেলার পরেও কখনো তেমন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া দুশ্চিন্তা হয় না কারো, ট্রাকবাহনে ভর করে বা দেশসুদ্‌ধু স্বজনের ওপর ভরসা করে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় ম্যাকমাহনের নির্জনতায় বা কুম্ভ মেলার জনারণ্যে, মেয়ের বিয়ের মতো গুরুদায়িত্বও অঘটনের ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে ঠিকই পৌঁছে যায় অনাবিল আনন্দ-তরঙ্গের সম্পূর্ণতায়! আর এইসব মৃদু কৌতুকের অজস্র অগোছালো না- পারার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে একটি স্বাতন্ত্র্যময় মুখ, অনেক না- পাওয়ার মধ্যেও জেগে উঠতে থাকে অনন্যসহায় মেয়ের এক স্বাধীন পৃথিবী, যার চলার বেগেই পায়ের তলায় জেগে ওঠে রাস্তা।

নামকরণের ওই বিচিত্র বিদ্রোহ গুলোর কথাও তখন মনে পড়ে যায় হয়তো তাঁর সেই পাঠকের, মনে হয়, কেবল কৌতুকের উপকরণই কি ছিল 'ভালো-বাসা' নামে ওই বিখ্যাত বাড়িটিতে একলা বেড়ে ওঠা শিশুকন্যাটির নিজেই নিজের নামকরণের ওই খেলাটায়? প্রচ্ছন্ন একটা চ্যালেঞ্জও কি ছিল না ওতে? যা তার নির্বাচিত নয়, মনোনীত নয়, হোকনা খুব শ্রদ্ধেয় কারো দান, তবু অপ্রার্থিত সেই দানকে কি মেনে নিতেই হবে তাকে? আজীবন বয়ে বেড়াতেই হবে অপছন্দের চাওয়া -পাওয়া দেওয়া - নেওয়ার ভার?

কোন নবনীতাকে চেনে তাঁর পাঠক? হাসির মোড়কে যে ঢেকে রাখে নিজের ক্ষতমুখ, হাসিমুখের আড়ালে রেখে দেয় নিজের নিভৃত রক্তক্ষরণ, তাকেই তো? কিন্তু তার আড়ালেও যে রয়ে যায় আরেক নবনীতা, যার এক চোখে দুলে থাকে জল, অন্য চোখটা খালি। নবনীতার ওই পাঠকের তো মনে পড়ে যায় তাঁর 'নির্বাচন' নামে সেই কবিতা, একুশ শতকে দাঁড়িয়ে যেখানে লিখেছিলেন তিনি- "আমার মাঝখানে আছে/ দুজন মানুষ--/ তুমি মন স্থির কর/ কাকে চাও/ তাকে, না আমাকে?'

নবনীতার মনোযোগী পাঠকেরা সকলেই জানেন, উপন্যাস লিখেছেন নবনীতা, কবিতা- গল্প- নাটক- ভ্রমণকথা -কী না লিখেছেন , অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধও লিখেছেন বৈকি, কিন্তু একটা মেয়ে কী লিখবে আর কী লিখবে না, তার তো একটা সমাজকাঙ্ক্ষিত প্যাটার্নও আছে, উচ্চারণ কবিতায় খুব স্পষ্ট স্বরে সে কথাও একদিন নিজেই তো লিখেছিলেন নবনীতা--" যুবতী নারীর ওষ্ঠে দুঃখ শব্দ মানায় না বস্তুত/ ও বড়ো কঠিন শব্দ, ওতে দাবি শুধু পুরুষের/ তোমরা তো সুখ নেবে, সুখ দেবে, সুখের পসারী/ সমর্থযৌবনা বরনারী"..; লিখেছিলেন, "তোমরা কবিতা হবে, তোমরাই কবির সম্পদ / অমন তীব্রতা কেন, চোখেমুখে মেঘছায়া কই?"

নবনীতা কি আর জানেন না, কেবল তীব্রতা কেন, ব্যঙ্গ, পরিহাস, রঙ্গতামাশা- এসব কিছুই মানায় না মেয়েদের কলমে! মেয়েরা তো নিজেরাই 'হালকা পলকা', খুব একটা তলিয়ে ভাববার মতো ওজনই নেই' তাদের, তাই লিখতে হলে তারা তো লিখবে 'পলকা বিষয়বস্তু নিয়ে গুরু গম্ভীর গদ্য পদ্য' আর 'গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে হালকা চালে'র লেখা?তেমন লেখার জন্য মেয়ের কলম কেন, ও কাজ তো 'মগজপ্রধান পুরুষের', 'আবেগপ্রধান নারীর' কাজ হালকা বিষয়ে সিরিয়াস সুরে লেখাটাই- এমনি সব অলিখিত সামাজিক প্রত্যাশার বাঁধাবাঁধনের মধ্যেই তো মেয়েদের লেখালেখি, এ দেশে, এ সমাজে ; আর কেবল এদেশ কেন, সব দেশে আর সব সমাজেই। তাইতো মেয়েরা আর

সব লেখে, প্রেমের কবিতা লেখে,লেখে ভূতের গল্প কিংবা রোমান্স, কিন্তু রসসাহিত্যিক হতে চায় না তারা, ছবি আঁকে কিন্তু কার্টুন আঁকে না কক্ষনো।

নবনীতা তো জানেন, রসসাহিত্যিকের মতো পৃথিবীর সমস্ত 'অকারণ অহংভাবের ফুলকো বেলুনে ছুঁচ ফুটিয়ে হাওয়া বের করে' দেওয়ার কিংবা 'মিথ্যের রহস্যময়তাকে অট্টহাস্যের ইট মেরে ঘুচিয়ে' সত্যিটাকে উন্মোচন করবার উপায়ই নেই মেয়েদের । মেয়েদের সামাজিক দায়িত্বটাই যে এর বিপরীত, মেয়েদের কাজই তো 'ছেঁড়াখোঁড়া টুটাফুটা রীতিনীতিকে সেলাই ফোঁড়াই দিয়ে রিপু করে তালি মেরে চালু রাখা' আর 'মিথ্যের হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়ে তাকে রহস্যে লুকিয়ে রাখা'; এই শতচ্ছিন্ন প্রথাগুলোকে অপরিসীম সহ্যশক্তি দিয়ে যেন তেন প্রকারেণ চিরায়ত করে রাখে তো মেয়েরাই। তবে? মেয়েদের কলম তবে কেমন করে ঝলসে উঠবে রঙ্গব্যঙ্গের প্রাখর্যে, স্নিগ্ধোজ্জ্বল হবে রঙ্গরসের সৌন্দর্যে?

এইসব কথাই লিখেছিলেন নবনীতা, পয়লা বৈশাখের আনন্দবাজার-এ 'হাসতে মোদের মানা' নামে এক লেখায় । শুধু এটুকুই নয়, সেখানে আরো বলেছিলেন নবনীতা, বলেছিলেন কেন মেয়েরা 'নিজেকে নিয়ে নিজের মতো করে হাসতেও' শেখেনি কখনো; মেয়েরা যে জানে, জানতেই হয় তাদের, সমাজে তাদের স্থান এমনই নির্দিষ্ট যে , নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখতে তাদের হবেই, 'সং সেজে ক্লাউনিং করলে তো চলবে না' তাদের। নবনীতার কলম তাই জানায়

"তাই আমরা লায়ন টেমার হতে রাজি। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শূন্যে ঝুলন দুলতে রাজি, রাজি সিংহের খাঁচায় মাথা গলাতে। কিন্তু হাস্যকর সং সেজে ইচ্ছে করে লোক হাসাতে রাজি নই। সার্কাসে মেয়ে ক্লাউন দেখা যায় না, কিন্তু প্রাণ হাতে করে ট্রাপিজ খেলতে দেখা যায়। ..রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী ভারতের ইতিহাসে অনেক, কিন্তু রাজসভায় বিদূষকের ভূমিকায়, সাহিত্যেও কখনও নারীকে দেখা যায়নি। আমার তো মনে হয় আজও বাঙালি মেয়ের পক্ষে নিজেকে ভারতের শাসনকর্ত্রীর ভূমিকায় চিন্তা করা বরং তুলনায় সহজ, নিজেকে বিদূষক হিসেবে ভাববার চেয়ে।

সেই কঠিন কাজটাই কিন্তু কবে থেকে যেন খুব সহজে করে আসছেন নবনীতা, রাজ্ঞী হওয়ার স্বভাবই অবশ্য নয় তাঁর, 'মাতৃয়ার্কি' নামে তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির ভূমিকায় লিখেওছিলেন, আজন্ম একেবারে প্রজাস্বভাবের তিনি, 'প্রজা বাই বার্থ'; কিন্তু বিদূষকের যে ভূমিকাটিতে সাহিত্যেও সহজে দেখা যায় না কোনো নারীকে, চেনা ছকের সেই আগল ভেঙে নিজের জন্য কবেই বেছে নিয়েছেন সেই ভূমিকাটি, সমাজের ছেঁড়াখোঁড়া টুটাফুটা রীতিনিয়মের দিকে তাকিয়ে যেমন, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়েও তেমনি হেসে উঠেছেন তিনি অনায়াসেই।

কিন্তু এতটাই অনায়াস, এতটাই সহজ কি সত্যি ছিল সবটা? দাম্পত্যের ভাঙা –গড়ার তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে দীর্ঘদিন বিদেশবাসিনী মেয়েটি যখন ফিরেছিলেন কলকাতায়, দুটি শিশুকন্যা সঙ্গে নিয়ে, পুরোনো শহরে নতুন করে আবার শুরু করেছিলেন দিনযাপন, সূচনার সে– মুহূর্তটি তো স্থির হয়ে আছে নবনীতার 'আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা' কবিতায়, সত্তর– দশকের শুরুতে লেখা কবিতাটিতে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতমুখ অনবগুন্ঠিত তাঁর–

এবার আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা,

আমিই তোমার প্রেম, তোমার পৃথিবী ।
ব্যূহ ভেঙে এই তো ফিরেছি, মৃতবৎসা, সসাগরা,
শূন্যকোল, অথচ দুধের ভারে অবনতস্তনী
এই দ্যাখো তলহীন লবণাম্বুরাশি দুই চোখে।

এসো তবে, চেয়ে দ্যাখো, কৌমার্য সন্ধ্যাসূর্য হয়ে কপালে জ্বলছে দীপ্র
ছুঁয়ে দ্যাখো নবনীততনু –আজ তোমারি সম্পদ –
আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা,
তোমার বিরহদশা ঘুচলো এবারে যেমনটি চেয়েছিলে, অবিকল তেমনি ফিরেছি।...

একটু তো বদলেই গিয়েছিল 'ভালো-বাসা' নামে চেনা বাড়িটারও ছন্দ। এক বছর আগেই প্রয়াত হয়েছেন নবনীতার বাবা, নরেন্দ্র দেব । অন্তরা আর নন্দনাকে নিয়ে দেশে ফিরে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নবনীতা যোগ দিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, শুরু হলো রাধারানী নবনীতা আর অন্তরা নন্দনা-- তিন প্রজন্মের একলা চলার , পরস্পরকে জড়িয়ে একলা- বাঁচার এক নতুন যাপন।

মা মেয়েতে জড়ানো এ সংসারের ছবি যে নবনীতার কত গল্পের পাতায় পাতায় ছড়ানো! সহগ– বিচ্ছিন্ন সংসারের ছবি সব, প্রয়াত বা প্রত্যাহৃত– কোনো পুরুষের ছায়াতেই ঢাকা পড়েনি সে –সংসার; তিক্ততা নয়, ক্ষোভ নয়, যন্ত্রণা তো নয়ই, যাপিত এ জীবনের ছত্রে ছত্রে বরং জড়িয়ে রয়েছে নিজেকে নিয়ে কৌতুক করতে পারার খ্যাপামি; 'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে', 'গল্পগুজব', 'ভালোবাসা কারে কয়' কিংবা 'নাট্যারম্ভ'র নানান গল্পে, এমনকি 'জরা হটকে,জরা বাঁচকে, ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান'– এর মতো গল্পেও ছড়িয়ে আছে নবনীতার এই মুখটাই ! এই মা আর মেয়েরই গল্প 'মাতৃয়ার্কি', মাতাকে ঘিরে ইয়ার্কি আর ম্যাট্রিয়ার্কির শব্দসাম্য মিলে মিশে যে–সব গল্পে ঝলমল করছে রাধারানী দেবীর মতো এক প্রখর ব্যক্তিত্বময়ীর সংসার; কেবল এই মা আর মেয়েই নয়, 'মাতৃয়ার্কি'র আখ্যানের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে যে আর এক প্রজন্ম, এই মেয়েই তো আবার সেখানে মা ; দু– জোড়া মা –মেয়ের এই সব গল্পে তিন প্রজন্মের আনন্দময় যাপনের সেই প্রাত্যহিকী পুনরাবৃত্ত কৌতুকে কতবার যে তুলে এনেছেন নবনীতা!

তবে ,কৌতুকের খোলসে অদ্যন্ত মোড়া হলেও, এই সমস্ত যাপন- কাহিনিতে যে অন্তঃসলিলা বয়ে চলা এক একলা মেয়ের সামর্থ্যের গল্প, সেই এক অনন্যসহায় অহংকারের গল্প ,সে -কথাটা মনে করাতে ভোলেন না নবনীতা। সুদেষ্ণা বসুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাই বলতে শুনি তাঁকে--

একক মায়ের সংসারের ছবিটাই প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে, মেয়েদের শক্তির ছবি । তিন প্রজন্মের পরিবারে সবাই মেয়ে। পুরুষ নেই , তবুও কিন্তু তারা সুস্থ মনে, হাসিখুশি জীবনে, হইচই করে, খেটেখুটে, হোঁচট খেয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে, পরিপূর্ণভাবে বেঁচে- বর্তে থাকতে পারে। এটা মোটামুটি একটা স্টেটমেন্ট।

কিন্তু এ যদি তাঁর স্টেটমেন্টই হবে, তবে এমন আপাদমস্তক কৌতুকে মুড়ে দিতে হলো কেন তাকে, এ কথার উত্তরটাও দিয়ে রাখতে ভোলেননি নবনীতা; ওই সাক্ষাৎকারেই বলেছিলেন,

হাসির মোড়কটা নিতে হয়েছিল ঘমানুষের কৌতূহল থেকে বাঁচতে, আর তাদের করুণা থেকে মেয়েদের বাঁচাতে। মেয়েদের প্রতি এত আহা উহু আমার সহ্য হত না। জীবনে কিছু অভাব, কিছু ফাঁক তো থাকবেই, তা বলে বাকি জীবনটুকু ভরে থাকবে না আহ্লাদে? নেই -নেই আমার ভাল লাগেনা। যারা হাসে, তাদের সব আছে। নিজেদের নিয়ে হাসির গল্প লেখা আমাকে ভিতর থেকে একটা শক্তি দিয়েছিল। সহজ আত্মবিশ্বাস জড়িয়ে থাকে তাতে।

এই সহজ আত্মবিশ্বাসী কলমই না লিখেছিল, সত্তর দশকের শুরুর ওই সময়টাতেই- 'আমাকে নেবাতে পারে এত শক্তি রাখে না সময়।' 'এই কাল: চিরকাল' নামের কবিতায় বেজে উঠেছিল একলা মেয়ের উচ্চারণ- 'সময় আমার সঙ্গে খেলে যাক যুদ্ধ -যুদ্ধ খেলা/ যতোই কাড়ুক শাড়ি, লজ্জাবস্ত্র ঠিক থাকে বাকি,/ মন্ত্রবলে বেলা হয়ে যাবে সব, যা ছিল অবেলা' ; আত্মবিশ্বাসী ঋজুতার সেই অকপট উচ্চারণ জানিয়েছিল- 'অখন্ড কালের পক্ষপাতধন্য আমি মহাশয়/ আমাকে রাঙাবে চোখ, এতো শক্তি রাখে না সময়।'

এই শক্তিময়ী আর কৌতুকময়ীর কলমই লিখেছিল- 'নিজেই নিজের কাঁধে হাত রাখি/ গালে টোকা মেরে বলি: চীয়ার আপ ওল্ড গার্ল!/ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় না ইদানীং/ বাতাসের স্বচ্ছতায় স্পষ্ট দেখি বানভাসি মুখ।'

আর এই ওল্ড গার্লটিরই জীবনের শেষ লেখায় ঝলমল করে উঠেছে শেষ শিরোনাম-- 'অলরাইট কামেন্ ফাইট্ কামেন্ ফাইট্!' মারণরোগের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে চেয়ে হেসে উঠেছে অবিনশ্বর কলম --'আমার কি তালা-ভাঙা দরজার অভাব আছে? আমার তো হৃৎকমল থেকে শ্বাসকমল- সব দরজাই আধখোলা। তো এই কর্কটকমলের এত মাতব্বরি কীসের? লাঠিসোঁটা একটু বেশি আছে বলে? দ্যাখো বাপু, এই বিশাল পৃথিবীতে কতরকম বড় বড় লড়াই- যুদ্ধ চলছে, সেখানে তোমার ওই লাঠিসোঁটায় ভয় পাব ভেবেছ? ওসব তো তুশ্‌চু! 'আই ডোন্ট কেয়ার কানাকড়ি -- জানিস আমি স্যান্ডো করি?'

নবনীতার প্রথম যৌবনের কবিতা মনে পড়ে যায় তাঁর পাঠকের, মনে পড়ে 'পাহাড়' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন নবনীতা, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' এর পাতা ওল্টালে চোখে পড়ে আজও --

কেউ বলুক, না বলুক, তুমি সব জানো।
তবু কোথাও পাহাড় আছে
ছোটো কথা, বড়ো কথা, ছোটো দুঃখ,বড়ো বেদনা
সব ছাড়িয়ে,
মস্ত এক হাসির পাহাড়।
একদিন
সেই পাহাড়ে ঘর বাঁধবো তোমার সঙ্গেই।
লোকে বলুক, না বলুক, তুমি জানো।

কেউ বলুক আর না-ই বলুক, জানি আমরা সব্বাই, কবেই সেই পাহাড়ে পৌঁছে গেছেন নবনীতা নামে অনন্যনির্ভর এক মেয়ে, সব ছাড়িয়ে , সব পেরিয়ে , সেই পাহাড়ে আপন মনে কবেই বেঁধে নিয়েছেন তাঁর ঘরখানি, আর অনেক অনেকদিন ধরে তাঁর দেশসুদ্‌ধু পাঠককে চিনিয়ে দিয়েছেন সেই আশ্চর্য পাহাড়ের ঠিকানাটা।

তথ্য এবং উদ্ধৃতির সূত্র

১. বইয়ের দেশ, জুলাই- সেপ্টেম্বর সংখ্যা.২০১২, সুদেষ্ণা বসুকে দেওয়া নবনীতা দেবসেন-এর সাক্ষাৎকার
২. 'শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর', শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫
৩. 'হাসতে মোদের মানা', আনন্দবাজার পত্রিকা, (১বৈশাখ বিশেষ সংখ্যা) ১৯৯০
৪. 'অলরাইট কামেন্ ফাইট্ কামেন্ ফাইট্', ভালো-বাসার বারান্দা, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন , ২৭ অক্টোবর ২০১৯
৫. শ্রেষ্ঠ কবিতা, নবনীতা দেবসেন, দেজ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০৯
৬. 'তুমি মনস্থির করো' ,নবনীতা দেবসেন , দেজ পাবলিশিং, ২০০৯

14th May, 2020 - A Phone Call

Anindita Mitra,Teacher, Department of English

"Hello, how are you?"

"Is that even a question?"

"True! Shouldn't have asked."

"Well. I'm bored. Glad you called."

"I was bored too. So grabbed a pack of Doritos and called you. Did you see all those stuck in other states. How very depressing!"

"O, I'm not even watching the news channels. And who watches TV nowadays. I'm glued to this awesome show on Netflix."

"I'm watching one on Amazon Prime. Did you see that movie Contagion? Boy, I tell you, it's exactly the same thing that's happening now. Scary!"

"Scary it is! Tell me something. Are you going out? Uncle, aunty?"

"Are you crazy! None of us are going out. You remember Mohan, our driver. We whatsapp him the list of essentials we need and he brings them along once a week. That's it. I can't even imagine going out! No way!"

"Me too. I see so many people roaming around the streets from my balcony. This lockdown is never gonna end, I tell you!"

"True that! Anyway, I've started painting again. There's so much free time. Will send you pictures."
"Please do. I've started uploading make-up tutorials on Instagram."

"I saw. They are amazing. Heart reacts only."
"Thank you! By the way, I heard you guys are in the red zone."

"Ya! I heard someone died in the next lane and he had tested positive."

"Be careful."

"O don't worry! We aren't going out. And what's with this drama? Thousands die in this country every day. 10-20 people dying of this virus is okay. People are being overdramatic."

"You're right! Bye now. Will call you later! I feel a bit feverish today."

ভার্চুয়াল ও ব্যক্তিগত

শিপ্রা ঘোষ

সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাপ্ গুলো স্মার্টফোনে ইন্স্টল করেছিলেন অঞ্জনা। নিজে করেননি। এসবে তার কোনোরকম পারদর্শিতা নেই। যা করার করে দেয় ঝুম্পি,—বোনের মেয়ে। ও-ই বছর চারেক আগে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল। ঐ খোলাই আছে নামমাত্র। নাড়াচাড়া করার তেমন উৎসাহ পান না তিনি। মাঝেমাঝে খুলে দেখেন। লাইক দেওয়ার শেয়ার করার অভ্যেস নেই কোনোদিন। অফিস আর সংসার নিয়ে সময় কেটে গেছে। অথচ এখন লকডাউনের পর দিনের প্রায় অর্ধেক সময়ই হোয়াট্স অ্যাপ্ আর ইউটিউবেই কেটে যাচ্ছে তাঁর। এর ওপর আবার ফেসবুক। কেউ নতুন বই পড়ার কথা বলছেন, তো কেউ নাচ -গান-কবিতার ভিডিও আপলোড করে দিচ্ছেন,— মুহুর্মুহু খবরের আপডেট আসছে—, আর ফেসবুকের দৌলতেই ভার্চুয়াল রান্নাঘরেরও দরজা খুলে ফেলেছি আমরা। কচুশাক থেকে পাস্তা ,ডালগনা কফি থেকে লেবু - ডালবড়া-পান্তার গল্প আর বাড়ির বিরিয়ানি-কাবাব সবই গুছিয়ে ছবি তুলে ক্যাপশান আর কাহিনি সহ গুছিয়ে পরিবেশন করছে কতজন।

রান্না করতে ভালোবাসেন অঞ্জনা। ভালোবাসতেন বলাই ভালো। এখন আর কার জন্যই বা এত সাজিয়ে রাঁধবেন তিনি মনের মতো করে?টুবাই খাবে না, টুবাইয়ের বাবাও না। তবু আজ ইচ্ছে করলো। আজ ২০ মে যে!ছেলে আর ছেলের বাবাকে এমন দিনে নিজের হাতে রেঁধে একটু না খাইয়ে কি পারেন তিনি? মন অস্থির করবে যে!

অঞ্জনা সারা সকাল রান্না করেছেন আজ। কোনোটি তার স্বামীর অতি প্রিয় । আর কোনোটি ছেলের। দুজনেরই মন রেখেছেন। কোন্ রান্নাটি বেশি ভালো, এই নিয়ে বাবা-ছেলের মজার ঝগড়া মনে করে রান্নাঘরেই হেসে ফেলেছেন বারকয়েক।
রান্না শেষ করে আরেকবার স্নান করলেন অঞ্জনা। পরিষ্কার ইস্ত্রি করা একটি শাড়ি পরলেন আজ। ছিমছাম একটু সাজলেন। তারপর খাবার টেবিলের কাছে এসে দুটি প্লেটে খাবার সাজালেন। স্বামী অতনু আর ছেলে টুবাইয়ের জন্য।
তারপর কী মনে হলো হঠাৎ । খুব যত্ন করে খাবার টেবিল আর খাবারের ছবি তুললেন বেশ কয়েকটি। বসে বসে কয়েক মিনিটে বাছলেন ছবিগুলি। তারপর যত্ন করে দুটি লাইন বাংলায় টাইপ করে লিখলেন—

আজ ছেলে আর ছেলের বাবার জন্য একটু শখের রান্না করে সাজিয়ে দিলাম। আমার রান্না ছাড়া ছুটির দিনে অন্য কোথাও দুপুরের খাওয়া কখনো খায়নি ওরা। আজ তো ছুটির দিন দুজনেরই,তাই-- -----এটুকু লিখে খাবারের ছবি সহ সব পোস্ট করে দিলেন ফেসবুকে। দিব্যি পেরেও গেলেন।

পোস্ট করার তিন মিনিটের মাথায় পোস্ট চোখে পড়লো ঝুম্পির। ঝুম্পির খাওয়া হয়নি তখনো। মা-কে বলে বাড়ি থেকে বেরলো ও। বললো,মানি-র কাছে খাই গিয়ে। ঝুম্পি যখন মানি-র বাড়ি এসে বেল দিলো ,অঞ্জনা নিজেই দরজা খুললেন। ঝুম্পি ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখে নিলো টেবিলের দুই প্রান্তে বাবা আর ছেলের ছবিদুটি রেখেছেন অঞ্জনা। মাঝখানে প্লেটে একরাশ বেলফুল---। ছবিতে মালা দিতে পারেন না তিনি এখনো। ঠিক চার বছর হলো।

—

A Dream in Three Parts

Anindita Mitra, Teacher, Dept. of English

Yesternight I dreamt.
It was an all-night affair
And unlike most other dreams,
I remembered every bit of it clearly
When I woke up today
Exhausted.
Needless to say they were nightmares
All three of them.
Those who know me, would know
I never dream happy
Even when I am.

I slept at around midnight
To find myself in a big hall
Full of men and women
All dressed for some occasion.
But I was ready to leave, when
A hand tapped on my shoulder
And a voice said,
"Be careful while you step outside.
It's all mud and water there."
It was a woman's voice, I think...
She and I started to search for ways
To go out of the hall
But everywhere we went
At every doorway
The puddles were knee-deep
And we started to drown.
But we never cried for help
At least, I didn't.
Drowning I woke up
Sweaty...and gulped down water
To put myself to sleep again.

I am walking in an empty street.
The woman's voice is there.

We are returning from somewhere
May be from that party.
But in front of us is something.
There are two men following
A woman! I nudge the voice,
"Something bad is going to happen."
And instantly there's a scuffle.
I hit my head on the pavement
And I wake up, yet again.

It's 3a.m. now and I'm afraid
To close my eyes.
A crow is cawing
Sitting right outside my window.
I close it and go back
To bed, to bed, to bed.
No, there's no knocking at the gate.

I am at home.
I've hit my head.
I'm coughing up blood.
My parents see that
But are not concerned!
My father asks me to open my mouth.
It's all blood!

I wake up.
It's 5:10a.m..
It's clear outside.
I sit right up on bed.
Let's not sleep anymore tonight
For sleep comes to the blessed, right?

Plague, Rumour, Resistance and Nationalism in colonial India

Sutapa Mukhopadhyay, Dept. of History

18th September 1896 was a Saturday. At 11am that day, Dr.Viegas made his way to Vor Gaddi for a house call. Dr.Viegas found his patient, a middle-aged woman, moderately feverish. Her speech and consciousness were impaired. ...She also had an enlarged lymph node in the groin. DR. Viegas could find no local ulcer or wound to explain it. He prescribed the usual remedies of his time for fever. Later that day, Dr.Viegas saw a second patient with a similar illness, a young man from the Port Trust Estate. On Sunday morning his first patient was dead. The young man was much worse and unlikely to survive. At the boy's bedside, Dr.Viegas made his momentous diagnosis.....He told the family that the boy was dying of bubonic plague. Later that afternoon, in the Petit Laboratory, Dr.Viegas, with the aid of a microscope, could view the pink-staining bipolar bacilli..... Five days later, a Standing Committee reviewed Dr.Viegas's findings. On 29th September, the Government of India, in the person of the Governor General Lord Elgin, was notified of the outbreak of plague in Bombay city by a telegram from the Governor, William Sandhurst.

One of the earliest references to plague in India had been during Jahangir, the Mughal emperor's reign. Another reference of plague was made by Manucci, the European traveller, which happened in the Deccan during 1702-04. The disease was believed to be contagious. European travellers even prescribed several remedies. The third plague pandemic in the late nineteenth century shook the major part of the world and eventually appeared in India through the port city of Bombay. At first the progress of the disease was relatively slow. However by December 1896 the epidemic phase began. Karachi and Poona were infected and by March the whole of Konkan, the district of Kutch, Kathiawar and several places of India were infected. Punjab was infected in October 1897. Bubonic Plague appeared in Madras and Bengal Presidency in the year 1898. Initially the British authority was slow to adopt serious measures to control the pandemic. But the European Commercial and industrial magnets exerted tremendous pressure on the colonial rulers to take stringent steps to control the disease since the British economy in India was dangerously threatened with the outbreak of bubonic plague. After the official recognition of the presence of plague in India the colonial government took certain steps to combat the situation. Lord Elgin, Viceroy, dispatched Surgeon – General Dr. Cleghorn to Bombay to report on the epidemic. George Hamilton, Secretary of State, pressurised the Government of India for stricter action. He asked for compulsory segregation and evacuation and the closure of Indian ports to Haj pilgrims.

The steps taken by the government to curb the fangs of the disease were not always acceptable to the colonised. There were instances of people raising an objection and a certain amount of concealment of sickness was there. Corpse inspection, particularly of the woman, was objectionable to common people. A fresh anti- plague resolution was issued by the Government in February 1898. In March 1898, a fierce riot broke out in Bombay centering the issue of

attempted removal of a Muslim female plague patient to hospital. The Bombay government was forced to reconsider the policy of house visitation. Indian press was critical of the Government's handling of the plague. Hitavadi writes, "The plague regulations have made the people more uneasy than the plague itself." Severe riots broke out in Mysore, Poona, Bombay, Punjab and Calcutta. Workers from textile mills protested against segregation. They assembled outside the Arthur Road Hospital of Bombay and threatened to wreck the building. The chief Plague Officer W.C. Rand and Lt. C.E. Ayerst were shot by Chapekar brothers in Poona in 1897. On the same day, Captain Ross was assassinated in Peshwar. Rumours which were related to the anti-plague measures of the Government were abuzz everywhere. In Calcutta, rumours began to spread rapidly when Sir John Woodburn, the Lt. Governor of Bengal held a meeting with doctors at the Eden Hospital to discuss the situation of plague in Calcutta. There was anxiety everywhere regarding the British soldiers forcefully entering the houses and dragging their wives and daughters in the pretext of plague examination. The rumours related to inoculation, seizing and searching led the people into a frenzy of rage. On 8th January 1898 Prabhat, a newspaper from Hyderabad, published a letter complaining of the manner in which medical examination of female passengers was conducted in a train at Malir. Another bone of contention was the vaccine. Dr. Waldemar Haffkine who invented the vaccine of cholera in 1892, was invited to Bombay in 1896 to prepare a plague vaccine. After preparing the vaccine Haffkine successfully inoculated himself first. Many distinguished citizens spoke in favour of inoculation. Aga Khan was one among them. In Bombay Jamshedji Tata was inoculated and insisted that all his servants be inoculated. He expressed the positive side of inoculation to his friends. In Calcutta, Raja Benoy Krishna Deb of Shovabazar was inoculated along with his whole family, including servants, with Haffkine's serum by the Health Officer. Raja took the precaution of making police arrangements. About two thousand people assembled near his house to watch the process of inoculation. Dr Cook, the Health Officer, inoculated the Brahmo leader Dwarakanath and Dr. Kadambini Ganguly along with sixty-one members of the Brahmo Samaj at 13, Cornwallis Street, which included men, women and children. Maulavi Mahomed Yusuf Khan Bahadur and Munshi Abdul Ali were inoculated before a large gathering of Muslim community. Women of their families were also inoculated. Swasthya Patrika of 1899 wrote about the necessity of the plague precaution and inoculation. However many were sceptical to its efficacy. Like Bombay, mass exodus continued in Calcutta. Rumour spearheaded that there were three kinds of serum --- one was meant for the sahebs, which was quite innocent, another was meant for the babus that brought on a little fever and the third was a deadly poison meant for the poor people. The last one, when injected into the system, would kill one in two or three hours. Local newspapers reported about the rising panic at different parts of the country. In Karachi, mass exodus continued during the process of inoculation in various centres of the town. Stories like inoculation which was believed to be forced on the natives, resulting in death in two hours caused great unrest in Darjeeling and many people were reported to have left the town. The Deputy Commissioner tried to convince the masses of the absurdity of the rumours. In Jessor Mr. Halifax, the District Magistrate, had to give assurance to the shopkeepers that

there was no intention, on the part of the Government, to inoculate them against their will. In Dacca people were doubtful about the holding of Provincial Congress Conference due to plague. An Inoculation Circular issued in 1898 over the signature of the Hon. Mr. H.H. Risley, Secretary to Government and President, Plague Committee stated, “This is to certify that no one shall be inoculated unless he expressly desires it.” The colonial Plague policy seemed to take control of the body of the colonised. The medical intervention was an opportunity to intervene and control the life of the Indians. However, with the passage of time, popular resistance grew up and the colonial government was forced to change its stringent measures to some extent.

A feeling of anti - colonialism grew up through the protest movements against the anti - plague measures enforced by the colonial government. The feeling of anti- colonial distrust was evident in the plague riots. In the aftermath of Poona murders, the Anglo- Indian press criticised the indigenous educated class. Suggestions were made for putting a stop to the associational politics of the people of the country. The Indian National Congress protested against this kind of suggestion. Mr. Shankaran Nair, President of the thirteenth session of the INC, criticised the Anglo- Indian press for its inability to understand the feeling of the native people. The thirteenth resolution of the INC opposed the move of the Government to increase the severity of the Law of Sedition. Opposition against this law came also from the Bengal Chamber of Commerce and the Calcutta Bar Association. Tilak’s publications on the occasion of the assassinations of Rand and Ayerst, were regarded as provocative. He was convicted of sedition and spent eight months in prison. Tilak emerged as the national hero of India. Historian David Arnold writes, “The significance of plague for the political epidemiology of colonial India was far greater than that of malaria or influenza, even though in any given year the mortality that caused might have been considerably greater.” A very important development happened in the field of medicine too. Side by side with the western medicine indigenous medicine for plague gained popularity among people. Ayurveda as a national science made its place in the imagination of modern India.

References:

Official Reports

1. A Compilation of Regulations issued by the Government of India and Local Governments in connection with plague, Calcutta: Office of Government Print , 1898.
2. Baker, E.N., Report on the Epidemics of Plague in Calcutta during 1898 and 1899 and up to June 1900, Calcutta: Bengal Secretariat Press.

Newspapers

1. Amrita Bazar Patrika.
2. Hitavadi.
3. Swasthya.

Books

1. Arnold, David, Colonizing Body: State Medicine and Epidemic Disease in

Nineteenth-Century India, University of California Press, Berkeley, 1993.
2. Echenberg, Myron, Plague Ports: The global impact of Bubonic Plague, 1894-1901. New York University Press.

3. Ghosh, Archana and Sami Anand, Plague in Surat: Crisis in Urban Governance, Concept Publishing Company, New Delhi, 1996.
4. Klein, Ira, Plague, “Policy and Popular Unrest in British India.” Modern Asian Studies, 1988.
5. Ratna, Kalpish, Uncertain Life and Sure Death: Medicine and Mahamaari in Maritime Mumbai, Maritime History Society, Bombay, 2008.

(T) BENGAL AIR SQN